বাংলাদেশে সাইবার বুলিং : প্রতিরোধ ও প্রতিকার

এ এম ইমদাদুল ইসলাম

বাংলাদেশে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনলাইন যৌন শোষণ ও নির্যাতনের ঘটনাও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। বিশেষ করে কিশোরী ও তরুণীরা প্রায়ই প্রতারণা, ব্ল্যাকমেইল এবং ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও ফাঁসের হুমকির শিকার হন। ২০২২ সালে ঢাকায় এক কলেজছাত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে এক যুবকের সঙ্গে পরিচিত হন। শুরুতে ওই যুবক বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করলেও পরে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা করে। একপর্যায়ে সে ভিডিও কলে ব্যক্তিগত মুহূর্ত রেকর্ড করে রাখে, যা ভুক্তভোগী বুঝতে পারেননি।

কিছুদিন পর যুবকটি সেই ভিডিও ও ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে টাকা দাবি করতে শুরু করে। শুধু তাই নয় সে আরও ব্যক্তিগত ছবি পাঠানোর জন্য চাপ দিতে থাকে। ভুক্তভোগী ভয় ও মানসিক চাপে বিষয়টি পরিবারকে জানাতে সাহস পাচ্ছিলেন না। পরে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠলে তিনি পরিবারের সহায়তায় পুলিশের সাইবার ইউনিটে অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন তদন্ত শুরু করে এবং প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিযুক্তকে শনাক্ত করে। পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ভুক্তভোগীর ব্যক্তিগত তথ্য অনলাইন থেকে অপসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর যুগে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। শিক্ষা, ব্যবসা, বিনোদন কিংবা যোগাযোগ সব ক্ষেত্রেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু প্রযুক্তির এই অগ্রগতির পাশাপাশি বেড়েছে অনলাইনভিত্তিক নানা অপরাধ, যার মধ্যে অন্যতম হলো সাইবার বুলিং। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী, নারী ও তরুণদের মধ্যে এ সমস্যা দিন দিন উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্তারের ফলে সাইবার বুলিং একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

আমাদের প্রথমে জানা দরকার সাইবার বুলিং কী? সাইবার বুলিং হলো ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ই-মেইল, অনলাইন গেম বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান, হুমকি, হয়রানি বা মানসিকভাবে আঘাত করার প্রক্রিয়া। এটি সাধারণ বুলিংয়ের আধুনিক রূপ, যা ভার্চুয়াল জগতে সংঘটিত হয়। সাইবার বুলিং বিভিন্নভাবে হতে পারে, যেমন-অপমানজনক মন্তব্য বা পোস্ট করা, ভুয়া আইডি খুলে অসৎ উদ্দেশ্যে কাউকে হয়রানি করা এবং ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্য অনুমতি ছাড়া ডিজিটাল প্লাটফরমে ছড়িয়ে দেওয়া। অনলাইনে গুজব রটানো, হুমকি বা অশালীন বার্তা পাঠানো, কাউকে সামাজিকভাবে হেয় করা বা করার চেষ্টা করা। ব্ল্যাকমেইল বা ট্রলিং করা এবং নারীদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানিমূলক বার্তা দেওয়া।

সচেতনতার অভাব, ডিজিটাল শিক্ষার সীমাবদ্ধতা এবং অনলাইন নিরাপত্তা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেকেই সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশে নারী ও কিশোরীরা তুলনামূলক বেশি সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ছবি বিকৃত করে ছড়িয়ে দেওয়া, অশালীন মন্তব্য, অনলাইন স্টকিং বা ভুয়া পরিচয়ে হয়রানির ঘটনা ঘটে। এছাড়া রাজনৈতিক মতামত, ধর্মীয় বিশ্বাস বা ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও অনেককে সামাজিক মাধ্যমে আক্রমণের শিকার হতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে সাইবার বুলিং আশঙ্খাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৫ সালে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের সময় "বুলিং ও নেতিবাচক মন্তব্য" অন্যতম প্রধান মানসিক চাপের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রায় ২৯ হাজার তরুণ-তরুণী এই জরিপে অংশ নেয়। UNICEF U-Report জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের শতকরা ৪৫ ভাগ তরুণ-তরুণী কোনো না কোনো সময় সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছে। অনেক শিশু অল্প বয়সেই ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু করছে এবং উল্লেখযোগ্য অংশ অনলাইনে অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, যা সাইবার বুলিং ও অন্যান্য অনলাইন ঝুঁকি বাড়ায়। সাইবার বুলিং সাধারণত বেশি দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়, Instagram, TikTok, Messenger ও অন্যান্য চ্যাটিং অ্যাপ, অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্ম এবং YouTube মন্তব্য বিভাগে।

বাংলাদেশে সাইবার বুলিংয়ের পেছনে একাধিক সামাজিক, প্রযুক্তিগত ও মানসিক কারণ কাজ করে। Facebook, Instagram, TikTok ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মে বিপুল সংখ্যক মানুষ সক্রিয় রয়েছে। অনলাইনে দ্রুত যোগাযোগের সুযোগ থাকায় অপমানজনক মন্তব্য, ট্রলিং ও হয়রানির ঘটনাও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ব্যবহারকারী জানেই না যে অনলাইনে কাউকে অপমান, হুমকি বা ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা অপরাধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। ভুয়া বা ছদ্মনাম ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ থাকায় কিছু ব্যক্তি পরিচয় গোপন রেখে অন্যদের হয়রানি করে। লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ন, অর্থনৈতিক অবস্থা, অঞ্চল বা ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে বিদ্রুপ ও বৈষম্যমূলক আচরণ অনেক সময় সাইবার বুলিংয়ে রূপ নেয়। বন্ধুত্ব, প্রেম, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে অনেকেই সামাজিক মাধ্যমে অপমানজনক পোস্ট, গুজব বা ব্যক্তিগত ছবি ছড়িয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে। শিশু-কিশোরদের অনলাইন কার্যক্রম সম্পর্কে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত নজরদারি না থাকায় তারা অনেক সময় বুলিংয়ের শিকার হয়। আবার নিজেরাও বুলিংয়ে জড়িয়ে পড়ে। কিছু মানুষ বেশি লাইক, শেয়ার বা ভিউ পাওয়ার জন্য বিতর্কিত, আক্রমণাত্মক বা অপমানজনক কনটেন্ট তৈরি করে। অনলাইনে সরাসরি মুখোমুখি যোগাযোগ না থাকায় অনেকেই তাদের কথার মানসিক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে না, ফলে আক্রমণাত্মক আচরণ বৃদ্ধি পায়।

সাইবার বুলিংয়ের ফলে ভুক্তভোগীদের ওপর উদ্বেগ, ভয় ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায় এবং হতাশা ও বিষণ্নতা দেখা দেয়। আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস কমে যায়। একাকিত্ব ও অসহায়ত্বের অনুভূতি তৈরি হয়। পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যায়। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে অনীহা তৈরি হয়। বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ কমে যায়। সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এছাড়াও অনিদ্রা বা ঘুমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। মাথাব্যথা, ক্লান্তি ও ক্ষুধামন্দা হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি মানসিক চাপ শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে আত্মক্ষতির প্রবণতা বা আত্মহত্যার চিন্তা দেখা দিতে পারে। জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসকের পরামর্শ না নিলে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

সাইবার বুলিং প্রতিরোধে তাহলে করণীয় কি? সাইবার বুলিং প্রতিরোধে ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে। ব্যক্তিগত তথ্য যেমন ফোন নম্বর, ঠিকানা, পাসওয়ার্ড, অবস্থান ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয়ভাবে শেয়ার করা যাবে না। শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে এবং দ্বি-ধাপ যাচাইকরণ (2FA) চালু রাখতে হবে। অপমানজনক বা উসকানিমূলক মন্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। হয়রানিকারীকে ব্লক ও রিপোর্ট করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রাইভেসি সেটিংস চালু রাখতে হবে।

অভিভাবকদের সন্তানদের সঙ্গে নিয়মিত অনলাইন নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করে তাদের সচেতন করতে হবে। তারা কোন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছে এবং কী ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছে, সে বিষয়ে খোঁজ রাখতে হবে। সন্তানকে দোষারোপ না করে সমস্যা জানাতে হবে এবং সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাইবার বুলিংবিরোধী স্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল নাগরিকত্ব ও অনলাইন আচরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করতে হবে। অভিযোগ গ্রহণ ও সমাধানের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা রাখা। শিক্ষক ও কর্মীদের সাইবার বুলিং শনাক্ত ও মোকাবিলার প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

সাইবার বুলিংয়ের শিকার হলে প্রথমেই নিজেকে শান্ত ও স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ভয় পাওয়া বা আতঙ্কিত হওয়া যাবে না। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে পরিস্থিতি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পরবর্তীতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের জন্য অপমানজনক বার্তা, পোস্ট বা মন্তব্যের স্ক্রিনশট এবং অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণ করা জরুরি। এরপর অপরাধীকে ব্লক করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে রিপোর্ট করতে হবে। বিষয়টি গোপন না রেখে প্রথমেই পরিবারের সদস্যদের জানানো উচিত। প্রয়োজনে বিশ্বস্ত বন্ধু, শিক্ষক বা অন্য কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির সঙ্গে বিষয়টি শেয়ার করা যেতে পারে। যদি সাইবার বুলিং গুরুতর হুমকি, ব্ল্যাকমেইল, পরিচয় চুরি বা অন্য কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের রূপ নেয়, তাহলে দ্রুত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে সচেতনতা, ধৈর্য এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সাইবার বুলিংয়ের ক্ষতিকর প্রভাব অনেকাংশে মোকাবিলা করা সম্ভব।

সাইবার বুলিং প্রতিরোধে সমাজে সকল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য অনলাইনে সম্মানজনক আচরণের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। সাইবার নিরাপত্তা ও ডিজিটাল নৈতিকতা নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। সাইবার বুলিং প্রতিরোধের মূল চাবিকাঠি হলো সচেতনতা, দ্রুত পদক্ষেপ এবং নিরাপদ অনলাইন আচরণ। সাইবার বুলিং শুধু সাময়িক কষ্ট সৃষ্টি করে না; এটি একজন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক জীবন এবং ভবিষ্যৎ বিকাশের ওপর দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সাইবার বুলিং প্রতিরোধ ও ভুক্তভোগীদের সহায়তা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

#

লেখকঃ জনসংযোগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার